

পঞ্চম অধ্যায় প্রতিবাদী নাট্যকার উৎপল দত্তঃ স্বাতন্ত্র্য বিচার

উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাটক প্রতিবাদের দলিল। তিনি নাটকের মাধ্যমে শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই করে গেছেন। নাট্যকার হিসেবে তিনি তাঁর নাটকে প্রতিবাদী চেতনার প্রতিফলন দেখিয়েছেন, এবং এর মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত চৈতন্যের জাগরণে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কাজটি করতে গিয়ে তিনি মার্কসবাদী মতাদর্শকে আশ্রয় করে তাঁর নাটকে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন; কখনো নাটকের বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব এনেছেন; কখনো নাটকের মধ্যে ইতিহাসের লক্ষ্যাভিমুখী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, আবার রাজনীতিকে মাধ্যম করে সমকালীন পরিস্থিতির সমালোচনা করেছেন। নাট্য প্রয়োগে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বহু মানুষের কাছে নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের চেতনা সম্পন্ন করা। আর এভাবেই তিনি সমকালীন নাট্যকারদের ধারার এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হতে পেরেছেন। উৎপল দত্ত বরাবরই ভিন্নমানের মানুষ ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি তাঁর লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলেন। মার্কসবাদে আসার আগে দর্শনের গোড়ার কথা ভাল করে পড়েছেন। মার্কসবাদী দর্শনে পূর্ণ আস্থা রেখে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি জীবন ও জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন। লেনিন, স্তালিন ও মাও-তুং-তুং এর বিপ্লবের তত্ত্বকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। সে কারণেই হয়তো তিনি নিজেসঙ্গে সর্গর্বে প্রোপাগান্ডিস্ট বলতে দ্বিধা করেননি।

নাটকের মাধ্যমে, পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত তাঁর মতাদর্শকে প্রকাশ করেছেন। তাই জীবন, সমাজ ধর্ম, রাজনীতি, থিয়েটার, কোন ব্যাপারেই তাঁর নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকা সম্ভব ছিলনা। তিনি বাধ্য ছিলেন পার্টিজান হতে। কেননা, কোন ব্যক্তির চিন্তা কখনো শূন্য থেকে সৃষ্টি হয় না। যে সমাজে তিনি বসবাস করতেন, যে ঐতিহ্যের তিনি উত্তরাধিকারী, যে শ্রেণীর তিনি মুখপাত্র এবং ইতিহাসের যে মুহূর্তে তিনি সক্রিয় ছিলেন এর সবকিছুই তিনি তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন।

“তিনি যেমন একদিকে বাংলা থিয়েটারের প্রতিটি ঐতিহ্য ভেঙেছিলেন, অন্যদিকে সে ঐতিহ্যকে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আনতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা থিয়েটারের বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিশাল ঐতিহ্য

আত্মস্থ করেই তা অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। তাই দেখি তিনি মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশের মহান ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েও এক জন মার্কসবাদী চিন্তাশীল হিসেবে তাদের পশ্চাৎপদতার কথাও অকপটে লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হন নি। যেহেতু নাট্যকার পরিচালকের শক্তি যাচাই হয় দর্শকের সামনে, তাই তিনি তাঁর যুগের দর্শকের চাহিদা পূরণ করেছেন বলেই তিনি যুগোত্তীর্ণ হয়েছেন।”^১

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব : উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে প্রতিবাদের ভাষা যথাযথ পরিস্ফুটনের জন্য নাট্যবিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যের ডালি উপহার দিয়েছেন। একদিকে তিনি যেমন দেশ বিদেশের বিভিন্ন নাট্যকারের নাটক (বিশেষ করে শেক্সপিয়ারের নাটক) মঞ্চস্থ করেছেন, অন্যদিকে দেশবিদেশের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর মৌলিক নাটকের মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও তিনি সফল হয়েছেন। প্রথমে যখন আধুনিক একনায়কতন্ত্রী হিটলারের পোষাকে ‘জুলিয়াস সীজার’ মঞ্চস্থ করলেন তখন থেকেই তাঁর প্রতিবাদী পথ চলার শুরু। এছাড়া বিভিন্ন একাক্ষ নাটক, পথনাটিকা, যাত্রাপালার মাধ্যমেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুতে যেমন রাজনীতি স্থান পেয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক ইতিহাসের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ঘটনা। তাছাড়া সমকালীন পরিস্থিতিতে দেশের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা। অন্যান্য নাট্যকারেরা যেখানে সমাজের নানা ভ্রুটি বিচ্যুতির কথা নাটকে তুলে ধরেছেন—তার পিছনে তাঁদের কোনো বিশিষ্ট রাজনীতি ছিল না। কিন্তু উৎপল দত্তের ছিল। তিনি সচেতন ভাবে রাজনীতিকে নাটকে প্রচার করেছিলেন।

“বাংলায় উৎপল দত্তই প্রথম নাট্যকার যিনি বিষয়বস্তু হিসেবে রাজনীতিকে তাঁর সমগ্র নাট্যরচনায় স্থান দিয়েছিলেন। অন্যান্যদের মতো নানা বিভিন্ন বিষয়ের নাটক রচনার ফাঁকে রাজনীতি বিষয়ক নাট্যরচনা করেননি। এইখানেই উৎপল দত্তের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য রাজনৈতিক নাট্যকারদের মৌলিক তফাৎ।”^২

বিষয় বস্তুর দিক থেকে উৎপল দত্তের নাটকে প্রতিবাদের কী বিশাল বিস্তার তা নীচের তালিকা থেকে সহজে বোঝা যাবে। উৎপল দত্ত তাঁর বেশ কিছু নাটকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন এদেশের ইতিহাসকে। সুদূর প্রাচীন ভারতের সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল থেকে নবজাগরণের পথিকৃৎ ডিরোজিও, মধুসূদন দত্তের সময়কাল পর্যন্ত তাঁর নাট্য বিষয় বিস্তৃতি লাভ করেছে।

<u>নাটক</u>	<u>বিষয়বস্তু</u>
১। সূর্যশিকার	প্রাচীন ভারতের রাজা সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালে শ্রেণীস্বার্থ এবং রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান সাধক কল্হনের যুক্তিবাদী বিজ্ঞান ভিত্তিক লড়াই।
২। সন্ন্যাসীর তরবারী	সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের গোড়া পত্তনের কালে বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের দলবদ্ধভাবে লড়াই।
৩। টোটা/মহাবিদ্রোহ	ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে ভারতীয় সিপাহীদের মুক্তির লড়াই বা সিপাহী বিদ্রোহ।
৪। তিতুমীর	ওয়াহাবী আন্দোলনের কাহিনী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং এদেশের ভূস্বামীদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ।
৫। কল্লোল	১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের ঘটনা। ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় নৌ-সেনাদের মুক্তির লড়াই।
৬। ফেরারী ফৌজ	ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার চরমপন্থী বিপ্লবীদের মুক্তির সংগ্রাম।
৭। টিনের তলোয়ার	সমাজপতি মৎসুদ্দি -বেনিয়াদের হাত থেকে এবং ব্রিটিশ নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের বাঙালি নাট্যকর্মীদের মুক্তির শপথ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম।
৮। রাইফেল	ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী লড়াইয়ের আলেখ্য।
৯। জালিয়ানওয়ালাবাগ	পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জমায়েতের উপর গুলি চালনা এবং নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া।
১০। একলা চলো রে	দেশভাগ , গান্ধী বনাম গান্ধীবাদের বিবাদ এবং গান্ধী হত্যার প্রকৃত রহস্য উৎঘাটনের প্রয়াস।
১১। অগ্নিশয্যা	সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন ও অন্যান্য মনীষীদের সমাজ সংস্কারের লড়াই।
১২। বণিকের মানদণ্ড	পরোধীন ভারতবর্ষে হেস্টিংসের আমলে ব্রিটিশের শাসন-শোষণ এবং দেশীয় মহারাজ নন্দকুমার বর্ধমানের মহারাণী প্রমুখের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

- ১৩। কৃপাণ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতে ১৯৫১ সালে গদর পন্থীদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান ও ব্যর্থতার কাহিনী।
- ১৪। অঙ্গার চিনাকুড়ির কয়লা খনির শ্রমিকদের ওপর মালিক পক্ষের নির্মম অত্যাচার ও শোষণের ঘটনা।
- ১৫। দাঁড়াও পথিকবর নবজাগরণের পথিকৃৎ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের সংগ্রামী ঘটনা এবং তৎকালীন সমাজ-সময়ের চিত্র।

উৎপলের নাট্যবিষয় শুধু এদেশের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছে, রাশিয়া, ফ্রান্স, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ভিয়েতনাম, রুমানিয়া এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসও বাদ পড়েনি।

নাটক

বিষয়বস্তু

- ১। লেনিনের ডাক রুশবিপ্লব ও লেনিন। লেনিনের কর্মচিন্তা ও বিপ্লবের আহ্বান।
- ২। লেনিন কোথায়? সোভিয়েতের মুক্তি সংগ্রাম। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব ও উত্তরকাল।
- ৩। স্তালিন -৩৪ বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার গঠন-প্রক্রিয়া এবং স্তালিনের কর্মপন্থার বিশ্লেষণ।
- ৪। নীল সাদা লাল ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতার ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লব এবং দাঁতের ভূমিকা।
- ৫। ক্রমবিদ্ধ কুবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিউবার জনসাধারণের মুক্তির লড়াই।
- ৬। প্রফেসর মামলক জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট অত্যাচার, ইহুদি ও কমিউনিস্ট নিধন, বিজ্ঞান সাধকের উপর নাৎসি বাহিনীর পীড়ন।
- ৭। মানুষের অধিকারে আমেরিকার বর্ণ বিদ্বেষ ও শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালো মানুষের লড়াই।
- ৮। অজেয় ভিয়েতনাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী সৈন্য ও জনগণের মরণ পণ প্রতিরোধ ও মুক্তির লড়াই।
- ৯। জয় বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা-শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মানুষের মুক্তি যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের লড়াই।

<u>নাটক</u>	<u>বিষয়বস্তু</u>
১০। ঠিকানা	পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবী যোদ্ধাদের মুক্তির লড়াই।
১১। শৃঙ্খল ছাড়া	জার্মানির বাডেন বিদ্রোহ। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ব্যাখ্যা।
১২। লালদুর্গ	রুমানিয়া ও রাশিয়ার লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সমকালীন সাময়িক বিপর্যয়। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কলঙ্কজনক ভূমিকা।
১৩। ব্যারিকেড	ত্রিশের দশকে জার্মানিতে কৌশলে নাৎসিবাদ ও হিটলারের অভ্যুত্থান। সেই সঙ্গে সত্তরের দশকের পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি ভয়াবহ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের ঐক্যবদ্ধ ব্যারিকেড তৈরী।

উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও উৎপল দত্তের নাটকে স্থান পেয়েছে দেশের আভ্যন্তরীণ কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যাতে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক বৈষম্য, মৌলবাদ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মতো নিন্দনীয় বিষয়। সমাজ সচেতন উৎপল দত্ত সমকালীন এসব ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, তাঁর কয়েকটি নাটকে যার পরিচয় পাওয়া যায়।

<u>নাটক</u>	<u>বিষয়বস্তু</u>
১। দুঃস্বপ্নের নগরী	সত্তরের দশকের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস -দমন-পীড়ন।
২। যুদ্ধংদেহী	১৯৬২ সালে চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ।
৩। তীর	কমিউনিস্ট শিবিরে ভাঙন ও ১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলন।
৪। এবার রাজার পালা	১৯৪৬ সালে পরাধীন ভারতের এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের পটভূমিতে সমকাল। সত্তরের দশকে ভারতের জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও তার প্রতিক্রিয়া।
৫। জনতার আফিম	সম্প্রীতির লক্ষ্যে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে জনতার সংগ্রাম।
৬। তুরূপের তাস	বান্দুং সম্মেলনকে ভেঙে দেওয়ার মার্কিন চক্রান্ত। ^৩

এ তালিকার মাধ্যমে তাঁর কয়েকটি মাত্র নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি রেখাচিত্র দেখানো হল। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও অনেক নাটকে বিষয়বস্তুর বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি কখনো একই বিষয় নিয়ে দুবার নাটক লেখেন নি।

“নাট্য ঘটনার ক্ষেত্রে সর্বত্রচারী উৎপল দত্ত নিয়ত সন্ধান করেছেন মানুষের সংগ্রামের

কাহিনী—এদেশ, বিদেশ, বর্তমান, অতীত-সর্বক্ষেত্রেই তিনি এই লড়াই, লড়াই এবং লড়াই করে মানুষের বাঁচার কথা বলে গিয়েছেন। হাঁটু গেড়ে দয়া প্রার্থনা নয়, উন্নত শিরে দৃপ্তভাবে ন্যায্য পাওনা আদায় করতে যাওয়া ইতিহাসের মানুষগুলিকে নাটকে জীবন্ত করে তুলেছেন।... নাটক এখানে শিল্পকলার দোসর নয়- সংগ্রামের হাতিয়ার।”^৪

তাই দেখা যায় তাঁর নাটক ও যাত্রা পালার নামকরণে অস্ত্রের এত অস্তিত্ব এবং হাতিয়ারে সমূহ উপস্থিতি। শুধু নাটকের ‘টিনের তলোয়ার’ নয় আরো বিভিন্ন অস্ত্র যেমন রাইফেল, তীর, টোটা, কৃপান, এর পাশাপাশি যুদ্ধ বিদ্যার বিভিন্ন অনুসঙ্গের কথা রয়েছে। যেমন—ফৌজ, ব্যারিকেড, দুর্গ, অস্ত্র প্রভৃতি নানা ধরনের অস্ত্রের নাম ব্যবহার করে এত বেশি নাটকের নামকরণ আর কোন নাট্যকার করেছেন বলে মনে হয় না।^৫ এত বেশি যুদ্ধ-বিদ্যার অনুসঙ্গের ব্যবহারও আর কারও লেখায় আছে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের কথা বলেন, ‘রাইফেল’ নাটকে তাদের কথা আর এক ভাবে আসে, ‘তীর’ নাটকে আসে অত্যন্ত দরিদ্র নিম্নবর্গ মানুষের তীর ধনুক নিয়ে আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা। তিনি ‘মানুষের অধিকারে’ নাটকে নিগ্রোদের হাতে রাইফেল তুলে দিয়ে তাদের যুদ্ধে নামিয়েছেন। ইতিহাসের গতি স্বীকার করেই তাঁর নাটকে এই শোষিত বঞ্চিত মানুষেরা কেউ জিততে পারেনি। ফেরারী ফৌজের লড়াই ব্যর্থ, নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান ব্যর্থ, ব্যারিকেডের পিছনে যারা দাঁড়িয়েছে তারা জানে তাদের লড়াইও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবু যতক্ষণ মানুষ চেতনাসম্পন্ন জীব ততক্ষণ তাকে লড়াই করতেই হবে। পরিণতি ব্যর্থ হবে জেনেও করতে হবে।

উৎপল দত্তের নির্মাণ ও সৃজনের ক্ষেত্রে নাট্যরচনার অংশ বেশ বড় মাপের। শুধু তাই নয় বৈচিত্র্যও তা চমৎকৃত করে দেবার ক্ষমতা রাখে। শেলডন কোলিয়ারির খনি দুর্ঘটনায়, ভুবন ডাঙ্গার বিপ্লবী, খাইবার জাহাজের সাদুল সিং, দক্ষিণবঙ্গের তিতুমীর, বার্লিনের উনশেরে স্ট্রাসে, অ্যালাবামার কালো মানুষ, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটার প্রমুখ চরিত্র এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো তাঁর নাটককে ব্যাপকতা প্রদান করেছে।

তাহাড়া শেক্সপিয়ার, ইবসেন, বার্নার্ডশ ব্রেন্ট, ওডেট এর ছায়া পড়েছে তাঁর নাটকে। মার্কস্ , গান্ধী, লেলিন, মাইকেল, এঁরাও তাঁর নাটকে এসেছেন নাট্য চরিত্র হয়ে। তাই বলা যায় বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন চরিত্র; ঘটনার সমাহারে উৎপল দত্তের নাট্যবিষয় অভিনবত্ব লাভ করেছে এবং এক ভিন্নমাত্রায় উন্নীত হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও সমকালীন পরিস্থিতির সমালোচনা : নাটকে রাজনীতির আমদানি

এক দুঃসাহসিক ব্যাপার। আর “বাংলা নাটকে যাঁরা সাহসিকতার সঙ্গে রাজনীতিকে মঞ্চে নিয়ে এসেছেন এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে অনন্য হলেন উৎপল দত্ত।”^৬ রাজনীতিকে মাধ্যম করে তিনি সমকালীন পরিস্থিতির সমালোচনা করেছেন, রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে “যে নাটকের রাজনীতি ভুল, তার সব ভুল।”^৭

প্রচলিত ধারণায় রাজনৈতিক নাটক বলতে আমরা বুঝি, যে নাটকে নাট্যকার কোন রাজনৈতিক কার্যাবলী, বিশেষ রাজনৈতিক দল-মতাদর্শ-সংগঠন ও সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারে ব্রতী হন। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির অর্থ ব্যাপকতর হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনার উন্মেষ বা কোন সামাজিক বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন ও সৃজন প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে গুণগত কারণেও নাটক রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে।

বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা খুবই গৌরবান্বিত কিন্তু এক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতার মধ্যেও উৎপল দত্ত তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। এ বিষয়ে উৎপল দত্তের পূর্বসূরীদের প্রসঙ্গ না তুললেই নয়। বাংলা রাজনৈতিক নাটকের আদি পর্বে সমাজ সংস্কার চেতনা এবং ইংরেজদের নির্মম শোষণের চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। রামনারায়ণ তর্ক রত্নের- ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’, দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণ’ মধুসূদন দত্তের- ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ’, মীর মোশারফ হোসেনের ‘জমিদার দর্পণ’ এসব নাটক রাজনৈতিক নাটকের পদবী পেয়েছে কেবল মাত্র সমকালীন সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধাচারিতার জন্য।

আবার জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পর্বে উমেশ চন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ দাস, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকারগণের রচিত নাটকে দেখা যায় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এর পরবর্তীকালে গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধারাই অনুসৃত হয়ে এসেছে। এরও পরবর্তীতে চল্লিশের দশকে যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং গণনাট্য প্রসূত নাট্য-রাজনীতিকে কেন্দ্র করে নাটক লেখা হয় তা পূর্বসূরীদের এই অনুসৃত নাট্যধারা প্রবাহেরই বিকশিত রূপ। উৎপল দত্তের নাটকের মধ্যে যে রাজনীতি রয়েছে তা এই ধারাবাহিক ঐতিহ্যের অনুসারী হলেও তা থেকে তিনি একটু ভিন্ন মাত্রায় বিচরণ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্যন্ত যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক লিখেছেন, তাঁদের নাট্যসৃষ্টিকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতিকেও বিষয় হিসেবে তাঁরা নাটকে এনেছেন। রাজনীতিই তাঁদের সমগ্র নাট্যসত্তার কেন্দ্রীয়

নিয়ন্ত্রক ছিল না। তাছাড়া তাঁরা রাজনৈতিক ঘটনাকে সরাসরি নাটকে আনেন নি, এনেছেন সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাতাবরণে।

কিন্তু উৎপল দত্ত কখনও আর দশটা নাটকের সঙ্গে সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক নাটকও লিখেছেন একথা বলা যাবে না।

“পূর্বসূরীদের থেকে স্বতন্ত্র উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকার ছিলেন। বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর উৎপল দত্তের প্রতিটি নাটকই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টি ভঙ্গির দ্বারা রচিত। স্বাভাবিক কারণে তাই উৎপল দত্তের নাটক ফ্যাসিবাদ বিরোধী বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।”^৮

তাছাড়া তিনি কোন রাজনৈতিক বাতাবরণেও তাঁর রাজনৈতিক মতামতকে আবৃত করে রাখেননি। তাঁর নাটকে শাসক-শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে একে বারে সরাসরি। উৎপল দত্তের এই অদম্য সাহস তাঁর নাটককে এক নতুন মাত্রা দান করেছে। উৎপল দত্তের নাট্যতত্ত্ব একটা রাজনৈতিক দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে যা মার্কসীয় দর্শন নামে পরিচিত। মার্কসীয় দর্শনের ‘দ্বন্দ্বতত্ত্ব’ কে তিনি তাঁর নাট্যপ্রযোজনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাংলা থিয়েটারে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন।

এই ‘দ্বন্দ্বতত্ত্ব’ হল একটি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের দুটি প্রধান সিদ্ধান্ত হল—

প্রথমতঃ এই বিশ্ব প্রকৃতির সকল বস্তুই পরস্পর সাপেক্ষ। পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন ঘটনারই তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ এই জগৎ স্থাণু নয়, সর্বদাই গতিশীল এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতিমুহূর্তেই কোন না কোন নতুন বস্তু ও ভাবের অবক্ষয় ও বিলোপ ঘটছে এবং কোন না কোন নতুন বস্তু ও ভাবের আবির্ভাব এবং বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু অনবরত এই যে বস্তু ও ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, এর কারণ হিসেবে এই বিজ্ঞান বলে—এই পরিবর্তনের কারণ বস্তুর অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দুটি বিপরীত শক্তি দিন রাত সংগ্রামশীল। এই দ্বন্দ্বের ফলে নতুনের আবির্ভাব ঘটছে এবং পুরোনোর তিরোভাব ঘটছে। এই ‘হ্যা’ এবং ‘না’ -এ দুটির দ্বন্দ্বের ফলেই জগৎ অনন্তর গতিশীল। তাই কোন বস্তু, কোন ঘটনা বা কোন চরিত্রকে শুধুমাত্র পরস্পর সাপেক্ষ দেখলেই চলবেনা সেই সঙ্গে তাঁর অবিরাম গতিময়তা বা পরিবর্তনশীলতার দিক থেকেও বুঝতে হবে। এই থিয়োরিই হচ্ছে উৎপল দত্তের থিয়েটারের ভিত্তি ভূমি।^৯

পৃথিবীর অনেক বড় বড় অভিনেতা বা পরিচালক এই দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু উৎপল দত্তের প্রয়োগ ভিন্নমানের।

“এক্ষেত্রে উৎপল দত্তের অনন্যতা হল এই যে শিশির ভাদুড়ী কিংবা স্তানিলাভক্ষি কিংবা চার্লিচ্যাপলিন যেখানে না জেনেই এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন, সেখানে উৎপল দত্ত সচেতন ভাবে মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব থিয়েটারে প্রয়োগ করেছেন। ওঁরা, ছিলেন ‘স্বতঃস্ফূর্ত’ উৎপল দত্ত হলেন ‘পরিকল্পিত-স্বতঃস্ফূর্ত’। এই পরিকল্পিত স্বতঃস্ফূর্ততার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের উপর ব্রেশ্টের এলিয়েনেশন তত্ত্বের প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী।”^{১০}

নাটকের পাশাপাশি তিনি যাত্রাপালা, একাঙ্কিকা বা পথনাটক রচনার মাধ্যমেও বাংলা নাট্য জগতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তিনি ধ্রুপদী নাট্যচর্চার আকর্ষণীয় ক্ষমতার বিশ্লেষণ করে বোঝেন যে থিয়েটারের মাধ্যমে জনজাগরণ ঘটাতে গেলে নাটক রচনার উপাদান নিতে হবে বর্তমানের সংঘর্ষ থেকে, কিন্তু লেখার সময় দৃষ্টান্ত ধরতে হবে প্রাচীন ক্লাসিককে। তিনি এও বোঝেন যে দর্শক মনের ওপর ঐতিহ্যের একটা প্রভাব থাকে। এই ঐতিহ্য দর্শকের প্রাত্যহিকতার মধ্যে নীরবে কাজ করে চলে দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ায়। তাই দেখা শোনার মধ্যে ডায়ালেক্টিকস প্রয়োগ করে বের করে আনতে হবে নাট্যবস্তুকে। আর সেই নাট্যবস্তুর মধ্যে যে নাট্যদ্বন্দ্ব হবে তা হবে মূলত শ্রেণীদ্বন্দ্বের এবং নাটকের নায়ক হবে আজকের সর্বহারা চরিত্র। মোট কথা এই যে—

“থিয়েটারের বিষয়বস্তু থেকে আঙ্গিক পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি উপাদানকেও মার্কসীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এই ক্ষেত্রেই উৎপল দত্ত তাঁর ইতিহাসগত পূর্বসূরীদের থেকে স্বতন্ত্র এবং অনন্য। বাংলা রাজনৈতিক নাটকের স্বতন্ত্র ইতিহাস কখনও রচিত হলে নিশ্চই দেখা যাবে যে আধুনিক বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ক্ষেত্রে বিগত চার দশক উৎপল দত্তই ছিলেন প্রধান পুরুষ।”^{১১}

সমকালীন নাট্যকারদের ধারায় উৎপল দত্তের প্রতিবাদী চেতনার বিশিষ্টতা : সমকালীন নাট্যকারদের ধারায় উৎপল দত্তের প্রতিবাদী চেতনার বিশিষ্টতার কথা কে অস্বীকার করা যায় না। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখ নাট্যকারগণ নবনাট্য আন্দোলন ও তার পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে যেভাবে তাঁদের নাট্যবিষয়ের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তার থেকে উৎপল দত্তের নাটক একটু স্বতন্ত্র মাত্রা বহন করে। উৎপল দত্তের প্রতিবাদী চেতনা মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রভাবে অস্বীকার করে নয়। তাই তাঁর বেশিরভাগ নাটকেই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে। তবে পরোক্ষ প্রতিবাদের আয়োজনও

কম নেই।

উৎপল দত্তের সমসাময়িক এই বিশিষ্ট নাট্যকারদের ধারায় তাঁর নাটকে প্রতিবাদী চেতনার বিশিষ্টতা ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে, নীচের আলোচনার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করা হল।

উৎপল দত্তের সমসাময়িক অন্যতম এক বিখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫-৭৮)। তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর 'নবান্ন' থেকেই বাংলার বর্তমান নাট্যধারার প্রবর্তন। তাঁর লেখাতেই প্রথম গরীব মানুষের কথা, বুভুক্ষু মানুষের কথা নাটকে উঠে এল। তাঁর শিল্পী প্রতিভার মধ্যে ছিল প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী মানসিকতা। তাঁর নাট্যে সাধারণ মানুষের কথাই বেশি স্থান পেয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, বুপড়ি বাসী, বস্তিবাসী, প্রভৃতি চরিত্র তাঁর সহানুভূতির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

একদিকে শোষণ-বঞ্চনা, অন্যদিকে সামাজিক, রাজনৈতিক অত্যাচার ও তার নিষ্পেষণে সাধারণ মানুষের দুর্বিসহ জীবনযাত্রাকে উপলব্ধি করে তিনি তাঁর নাটকে হাজির করেছেন। কৃষকের দুরবস্থা শ্রমিকশোষণ, মধ্যবিত্ত চরিত্রের ত্রিশঙ্কু অবস্থা এবং তার সাথে জীবন সম্পর্কে বলিষ্ঠ আশাবাদী চেতনা তাঁর নাটকে সার্বিক রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর নাটকের মাধ্যমে শ্রেণীসচেতন, সমাজ বিশ্লেষণ, প্রতিবাদ এবং সংগ্রামের জেহাদ ঘোষিত হয়েছে। 'নবান্ন' নাটকের মধ্যে তিনি মন্বন্তর ক্লিষ্ট মানুষের অন্নাভাব, নারীর যৌবন বিক্রী করে বেঁচে থাকার চেষ্টা, এবং শেষ পর্যন্ত কৃষকদের সংগঠিত করে সমবেত লড়াই-এ সামলি হবার ডাক দিয়েছেন।

বিজন ভট্টাচার্যের দু'একটি নাট্যবিষয় আলোচনা সূত্রেই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে। তাঁর একটি অসাধারণ নাটক 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬)। এ নাটকের মূলে রয়েছে কৃষক আন্দোলনের পটভূমি। এতে কৃষক নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে। রাঢ়ভূমির সাঁওতাল-আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায় জোতদারের হাতে শোষিত বঞ্চিত হয়ে তাদের নিজ অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার ছবি এঁকেছেন নাট্যকার।

জমিদারী প্রথা বিলোপের পরেও মধ্যস্থত্বভোগী মহাজন প্রভঞ্জন বেনামীতে সমস্ত জমি নিজের দখলে নিয়ে আসে। কৃষি ঋণ আর কর্জা ধানের সুদ যোগাতে গিয়ে দরিদ্র চাষীর দল সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। মহাজন প্রভঞ্জনের মতো সামাজিক, অর্থনৈতিক অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং পরিস্থিতির বদল ঘটানোই ছিল নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই মংলার হাতের উদ্যত টাঙি গিয়ে পড়েছে প্রভঞ্জনের মাথার উপর। এবং প্রভঞ্জনের অত্যাচার-অপশাসন থেকে মুক্তি পায় সাধারণ মানুষ। 'নবান্ন' নাটকের যে প্রতিবাদ- প্রতিরোধ ছিল প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে, 'দেবীগর্জন' নাটকে সেই প্রতিরোধ রয়েছে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। 'নবান্ন' কিংবা

‘দেবীগর্জন’ দুটি নাটকের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সর্বহারা মানুষ পুনরায় ফিরে এসেছে এবং অপশক্তিকে দমন করে তার উপর নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সম্মিলিত প্রয়াসে নির্মাণ করেছে ধর্মগোলা। এমন সুচিন্তিত এবং সূক্ষ্ম প্রতিরোধী ভাবনা বিজন ভট্টাচার্যের এক অসাধারণ কৃতিত্ব। দুটি নাটকেই নাট্যকার একক নায়ক চরিত্রের অবসান ঘটিয়ে তার জাগ্রায় নিয়ে এলেন কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের সমবেত প্রতিরোধের ক্রিয়াকলাপের কথা। এই মানুষগুলিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঠিক তেমনি উৎপল দত্তের নাটকেও সাধারণ মানুষ উঠে এসেছে নায়কের ভূমিকায়। যেমন—‘অঙ্গার’, ‘কল্লোল’। ‘অঙ্গার’ নাটকে কোলিয়ারির শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের কথা রয়েছে। আবার ‘কল্লোলে’ রয়েছে বস্তির অগণিত সাধারণ মানুষের কথা, জাহাজের রেটিং ও গানারদের কথায় যারা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সমবেত ভাবে অংশ নিয়েছেন।

উৎপল দত্তের নাটকের সাধারণ মানুষগুলি নির্দিষ্ট একটি মতাদর্শকে সামনে রেখে তাদের সমবেত ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে গেছে যা বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যচরিত্রে সেভাবে লক্ষ করা যায় না। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে তবুও উৎপলের নাট্যচরিত্রগুলি অনেক বেশী কৌশলী, তারা আবেগ তাড়িত নয়। ‘দেবীগর্জন’-এ চাষীরা জমিদার প্রভঞ্জনকে যেভাবে আক্রমণ করেছে, তাতে রয়েছে প্রবল আবেগ। সমবেত জনতা ধর্মগোলায় দখল নেওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে মারমুখী হয়েছে। সমবেত জনতার চক্রবৃত্তে পড়ে প্রভঞ্জনের যখন পালাবার পথ নেই এমন সময় রত্নার মৃতদেহ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসে মংলা। রত্নার মৃতদেহ মাটিতে শুইয়ে দিয়ে এক কঠিন কর্তব্য করার পক্ষে সে হাত বাড়িয়ে অস্ত্র খোঁজে—

“ঘুগর্যা মংলার হাতে টাঙি এগিয়ে দেয়। একটি মুহূর্ত মাত্র। দৃশ্যভঙ্গিতে দু-হাতে ঘুরিয়ে ধরে টাঙি মংলা প্রভঞ্জনের মাথার ওপর। আশেপাশের সমস্ত অস্ত্রগুলিও বিলিক দিয়ে ওঠে শত্রুকে লক্ষ করে। মহিষাসুর-বধের একটি স্থির চালচিত্রে পশ্চাতে বাঁধের ওপর মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে প্রভঞ্জন-নিধন পালায় যবনিকা পড়ে।”^{২২}

বিজন ভট্টাচার্যের দুটি আলোচিত নাটকে দেখতে পাই পরিণতিতে কল্পিত শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্য সাধারণ কৃষক সমাজ সমবেত হয়ে লড়াই করেছে। দেবীগর্জনে তারা প্রভঞ্জনকে হত্যা করেছে। উৎপল দত্তের কোনো নাটকেই কিন্তু এই শুভংকর পরিণতি নেই। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সব ক্ষেত্রেই অত্যাচারী শত্রুর হাতে এই শ্রমিক বা কৃষক সমাজ কিংবা দেশ স্বাধীনতার লড়াই-এ অংশ নেওয়া মানুষগুলি মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়েছে। ‘কল্লোলে’ ধর্মঘটীরা শাস্তি

পেয়েছে, ‘তীর’ নাটকে আন্দোলনরত কৃষকরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এদের লড়াই একটা আদর্শকে কেন্দ্র করে ক্রমশ সংঘটিত হয়েছে। ‘তীর’-এর ভাগচাষীরা কিন্তু তেমন আবেগের বসে অতর্কিতে পরিকল্পনাহীন ভাবে আক্রমণ করেনি। জমিদার তার পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় যেমন কৌশলে একটু একটু করে ভাগচাষীদের প্রাণে মারে, ঠিক সেভাবেই তারা নিজেদেরকে তৈরী করে, সেখানে কোন আবেগ প্রাধান্য পায় না, প্রাধান্য পায় ভাগচাষীদের স্বার্থ-একটা আদর্শ। তাই তারা কৌশলে জমিদার সত্যবানকে পুকুরের পাঁকে ফেলে দেয়। সত্যবান ধীরে ধীরে পাঁকে তলিয়ে যায়। অর্ধপ্রোথিত সত্যবানের মুখে মংলু যখন পদাঘাত করে তখন জনাকু বলে—“ছি ভদ্র হও, মংলু, ওঁদের কাছে শেখো, ভদ্র ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কি ক’রে আটটা মেয়ে-বাচ্চা-অজাত শিশুকে মারতে হয়।”^{১৩} পুকুরের পাঁকে জমিদার সত্যবান ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। তার মৃত্যুর আগে জনাকু সত্যবানের কাছে জানতে চায়—

“কী হলো? বলে যান, বাবু, শিক্ষা কেমন পেয়েছি? আগে ছিলাম চাষাদের মতন-
রেগে যেতাম, দশটা কথা কইতাম, আবার গলে যেতাম। দয়া-মায়া, ভালোবাসা-
এইসব চাষাড়ে বৃত্তি, মজদুরি ভাব এসে পড়ত জানেন? এখন কেমন মনে হচ্ছে
বলুন তো? ভদ্র নয়? আপনাদের মতন নয়? আপনাদের ভদ্র নিষ্করণ বিবেকহীনতা
কেমন শিখেছি বলে গেলেন না? ... ওদের মতন নিষ্ঠুর না হতে পারলে ওদের
হারাবো কি করে?”^{১৪}

আর ঠিক এখানেই উৎপল বাবু স্বতন্ত্র।

উৎপল দত্তের সমকালীন নাট্যধারার একজন স্বনামধন্য নাট্যকার শঙ্কু মিত্র। বাংলা নাট্য সাহিত্যে তিনি নাট্যকার হিসেবে নতুন মাত্রার সংযোজন করেছেন। সমাজের অন্ধকার জগতের শক্তি কিভাবে সততা, ন্যায় আদর্শকে বিনষ্ট করে চলেছে তারই প্রামাণ্য দলিল তাঁর ‘চাঁদ বণিকের পালা।’ তবে এই অপশক্তির জয় নয়, এর বিরুদ্ধে আদর্শের লড়াইকে সংগঠিত করেছেন তিনি তাঁর নাটকে।

তাঁর নাটকে বারবার উঠে এসেছে অন্ধকারের প্রসঙ্গ। এই অন্ধকারের অশুভ শক্তি কখনও রাষ্ট্র হতে পারে, হতে পারে স্বার্থায়েষী কিছু দুর্জন। এরকমই সর্পিল অন্ধকারের কথা জানা যায় তাঁর ‘চাঁদ বণিকের পালা’ (১৯৬৫), নাটকে।

নাটকটিতে চাঁদ বণিক সততার প্রতীক। তিনি সর্পিল অন্ধকার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চান। কিন্তু অন্ধকারের মানুষ যারা তারা বিভিন্ন অপবাদ অপকর্মের দ্বারা তাঁর কর্মোদ্যম মনকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে চলে। অবক্ষয়িত এই সমাজকে যারা সুস্থ থাকতে দিতে

চায় না তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে চাঁদ বণিকের ত্রিয়াকলাপের দ্বারা। এ প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ, তবে অনেক বেশি সুচারু এবং শিল্প সম্মত।

সমাজের শৌর্য-ধর্ম, ন্যায়-নীতি, এসব ঐতিহ্যকে বাঁচানোর জন্য চাঁদ বণিকের আশ্রয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাই সে আদর্শের দেবতা আলোর দেবতা শিবের পূজা করে এসেছে। সমুদ্রপাড়ি দেবার মাধ্যমে অন্ধকারকে ভেদ করে সত্যের আলোয় পৌঁছাতে চেয়েছে। কিন্তু অন্ধকারের দেবী মনসার ভক্ত যারা—মাণ্ডলিক বেণীনন্দন ও তার অনুচর দল তারা কুটিল চক্রান্তের দ্বারা চাঁদের উদ্যমকে, তার মান-সম্মত, পরিবার-সঙ্গী সকলকে আক্রমণ করেছে এবং সত্যের পথ থেকে বিপথে চলতে বাধ্য করেছে।

মনসার সর্পিলা অন্ধকারের সঙ্গে চাঁদ বণিকের লড়াই এ নাটকের মূল বিষয়। এ লড়াই যুগে যুগে অপশক্তির বিরুদ্ধে চিরন্তন লড়াই।

শম্ভু মিত্রের নাটকে দেখা যায় সামগ্রিক বিনষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সব শ্রেণীর মানুষকেই তিনি জটিলতর স্তর থেকে দেখতে চেয়েছেন। সমাজ ও অন্যান্য সম্পর্কের মধ্যে এই জটিলতর অনুসন্ধানের ফলে তাঁর নাটকগুলি অন্ধকারময়। এ অন্ধকার কেবল সমাজ ও সময়ের নয় মানুষের নিজেরও অন্ধকার।

রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমাজ জীবনে শম্ভু মিত্র যে পচন দেখতে পেয়েছিলেন, তার মধ্যে আশার কোন আলো ছিল না। সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার মধ্যে চাঁদ বণিক যে স্বপ্নের, যে আদর্শের অনুসন্ধান করেছিলেন তার মধ্যে তিনি শুধু ব্যর্থতাই দেখলেন। এই ব্যর্থতার মধ্যেও একমাত্র ভরসা ছিল লক্ষ্মীন্দর-বেথলার ভালোবাসার পবিত্রতা, সেও নির্মূল হল। মূল কাহিনীকে এড়িয়ে রূপকের আড়ালে ষাট সত্তর দশকের করাল সময় নাটকটিতে যেভাবে দুই তরুণ-তরুণীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তাঁর নাটকীয়তায় আমাদের শ্বাসরোধ হয়ে যায়।

শম্ভুমিত্র সমকালকে ধরতেই তাঁর নাট্য সাধনা শুরু করেছিলেন। সে সাধনা যতই এগিয়ে গেছে তাঁর সেই সমকালের অভিজ্ঞান ততই ভাষা খুঁজেছে অতীতের নাট্যাশ্রয়ে। ‘চাঁদ বণিকের পালা’ও এর ব্যতিক্রম নয়। কাহিনী কাঠামোর গোড়া থেকেই নাট্যকার মনসা পালার ফ্রেমটুকু রেখে বাকি সব বদলে বদলে এগিয়ে গেছেন। যত এগিয়েছেন তত যেন তাঁর অন্ধকারের সঙ্গে মনুষ্যের লড়াইয়ে কাহিনীটি কাঠামোর মাপ ছাড়িয়ে গেছে।

এ নাটকটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নীতিহীনতার বিরুদ্ধে তমসার বিরুদ্ধে এক অসামান্য প্রতিবাদ। এতে হতাশা আছে কিন্তু সকল কিছুকে ডিঙিয়ে পাওয়া যায় এক তীব্রতার আন্দাজ, দুর্জয় ক্রোধের উন্মেষ, সীমাহীন ঘৃণার অভিব্যক্তি। যার প্রকাশ চাঁদ বণিকের উক্তি। চাঁদের

জমানো ক্ষোভের মুখে নিষ্কৃতি পায়নি দেবতাদের স্নেহ ধন্য রামায়ণ-মহাভারতের নায়কেরাও। আবার সেই ক্ষোভ লজ্জা ঘৃণা ক্রোধ আকাশ প্রমাণ ধিক্কার হয়ে ফেটে পড়ে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে আনা বেহুলার স্বীকারোক্তিতে।

মৃত স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর পর স্বামীকে নিয়ে ফিরে এসে বেহুলা যখন চাঁদকে বলে— “শ্বশুর, আমি আর সে বেহুলা নই। তেত্রিশকোটির সেই কামোৎসুক চোখের সুমুখে যে নাচ নেচেছি -শ্বশুর সে বড়ো অশ্লীল।”^{১৫} আবার স্বামীকে বলে— “লাস্য নৃত্য করেছে বেহুলা। অজস্র লোকের প্রতি কটাক্ষ করেছে, ঘাঘরা সর্যায়ে উরুদেশ দেখায়েছে, কাঁচুলি শিথিল কর্যা - লাজহীনা, লাস্য নৃত্য করেছে বেহুলা, —যাতে সে তোমারে চম্পক নগরে ফের ফিরি দিতে পারে।”^{১৬} অন্ধকারের শক্তি মানুষের মান সন্ত্রম ইচ্ছা-অনিচ্ছার কতটা বেইজ্জত করতে পারে তারই বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া এ কথাগুলি।

চাঁদের সঙ্গী ন্যাড়া সব দেখে শুনে শুধু বলে “সদাগর, পৃথিবীটা এই ভাবে চলছে কি চিরকাল? চলে তবু ধ্বংস হয়নাক?”^{১৭} বাস্তবিকই পৃথিবীটা ধ্বংস হয় না, এবং আশ্চর্য যে ধ্বংস হয় না বিধ্বস্ত মানুষও। তাই নানা হেনস্তায় ক্ষতবিক্ষত বেহুলা যখন জীর্ণ চাঁদকে বলে “বেহুলার আধখানা মন কয়, (মনসার) পূজা তুমি দিওনা শ্বশুর। যতো কষ্ট কর্যা থাকি আমি—সমস্ত বিফলে যাক, তবু সন্তান তো তোমাদের। সিদ্ধান্ত তোমার।”^{১৮}

বেহুলার এসব কথা যেন সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে বলা, সমস্ত মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়ার জন্যই বলা হয়েছে। নাড়া খেয়ে খেয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে হয় আর স্থির প্রত্যয়ে পৌঁছাতে হয় এমন এক স্থানে যেখানে ঠুনকো আশাবাদ নয়, চরম বিশ্বাসহীনতার গহন থেকে গুমরে গুমরে উঠে আসে এক ইম্পাত কঠিন আক্রোশ।

চেনা সময়, অতি পরিচিত চরিত্রগুলিকে অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনতে হয়, দেখতে পাওয়া যায় কোন কোন জায়গায় তাদের অবস্থান। চরিত্রগুলির সংকট বা মহৎ উপলব্ধি সব কিছুই যেন সকল মানুষের সংকট বা উপলব্ধি হয়ে দাঁড়ায়। আসলে ‘চাঁদ বণিকের পালা’ মঙ্গলকাব্যের আদলে বর্তমান সমাজের, বর্তমান কালের এক কাব্য হয়েও অবিশ্রান্ত জীবনের এক অসামান্য দর্শন হয়ে ওঠে। চাঁদ বণিক যেমন সততার প্রতীক, সে যেমন অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, ঠিক তেমনি ‘সূর্যশিকার’ নাটকে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনমৃত্যুকে বরণ করেছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু কল্হন। তিনি বিজ্ঞানের ধ্রুব সত্যকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজধর্মের ব্যাভিচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। রাজশক্তির কালো হাত শেষ পর্যন্ত সত্যের আলোক শিখাকে নিভিয়ে দিতে পারেনি। কল্হনের মতাদর্শ, তাঁর লেখা পুস্তক দাসী মাধুকরির পুত্রের মাধ্যমে পৌঁছে যায় দূর থেকে

দূরান্তরে। তাঁর বিজ্ঞান সাধনা, বিজ্ঞানের সত্যের রহস্য একদিন উদ্ঘাটিত হবেই হবে। আর এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিতেই উৎপল দত্তের নাটক একটু আলাদা।

আধুনিক কালের একজন প্রথিতযশা নাট্যকার বাদল সরকার। অ্যাবসার্ড নাটক, থার্ড থিয়েটার প্রভৃতি বিদেশী নাট্যচিন্তার দ্বারা তিনি তাঁর নাটকে প্রতিবাদী চেতনাকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছেন। তাছাড়াও দেশীয় রীতির মাধ্যমেও তাঁর নাট্য প্রয়োগ দেখা যায়। বাদল সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য একাংক নাটক ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’। নাটকটি গ্রামীণ জীবনের এক বিশেষ সংস্কৃতি কবিগান বা পাঁচালীর মাধ্যমে একপক্ষে শ্রমিক কৃষক এবং অপরদিকে সরকার মহাজন পক্ষের হয়ে কবির লড়াই চলছে দু’জনের মধ্যে। দু’জনের পারস্পরিক সংগীত লড়াইয়ের মাধ্যমে গরীব চাষীদের দুর্দশার কথা এবং মহাজনের শোষণের কথা চিত্রিত হয়েছে।

মহাজন মজুতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ নাটকটিতে। একপক্ষে তরুণ কবিয়াল পচা সে লক্ষ্মীছাড়া। কারণ সে মনে করে লক্ষ্মী তাকে ছেড়ে গেছে এবং মহাজনের গোলাম হয়ে মজুতদারদের লরি চেপে কালোবাজার আলো করে ব্যাঙ্কে চলে গেছে। তাই সে পাঁচালীর সুরে বলে—

“আমরা যারা গতর খাটাই, ফসল ফলাই খেতে।

দুটি বেলা দু’মুঠো ভাত তাও জোটেনা পাতে।।”^{১৯}

পচা আরো জানায় যে মহাজন-কালোবাজারিরা গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তথাকথিত বাবুদের ঘরে রোশনাই চলে কৃষকদের ঘর অন্ধকার করে। কর্তা বা মহাজনেরা খায় দুধ-ঘি আর কৃষকেরা উপবাস করে মরে। তেভাগা নিয়মানুসারে ভাগচাষী বারোয়ানার তিন ভাগ ফসল পাবার কথা কিন্তু বাস্তবে তার উণ্টোটা হয়। গ্রামীণ মানুষের ওপর মহাজনদের এমন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কবিগানের মাধ্যমে সুকৌশলে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন নাট্যকার।

এ নাটকে পচা যেন গ্রামভিত্তিক দেশের প্রকৃত প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে উঠেছে। পাঁচালীর ভঙ্গিতে উপরে কৌতুকরস থাকলেও বিষয়ের গভীরে রয়েছে করুণরস। দেশ ও সমাজের ভিত্তি কৃষি ও কৃষক সমাজ। তাদের জীবনচিত্র, অনাহার, মহাজনী শোষণ, দারিদ্র্য এই নাটকে পাঁচালীর মাধ্যমে প্রকাশিত।

উণ্টোদিকে খুড়ো চরিত্রটি মহাজন বা সরকার পক্ষের প্রতিনিধি হয়ে তাদের সাফাই গেয়েছে। কিন্তু খুড়ো চরিত্রের দৃঢ়তা, ব্যাপ্তি পচা চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি। কেননা এই খুড়ো চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে দুর্বলতা। তার যুক্তি চিরকাল মহাজনেরা যা করে এসেছে তা এখনও হবে। কিন্তু চিরকাল হয় বলে তা এখনও হবে এ যুক্তি পচার কাছে গ্রহণযোগ্য

নয়।

নাট্যকার পাঁচালী অর্থাৎ একটি দেশীয় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে হালকা চালে খোশ মেজাজে অতি সহজ ভাবেই শোষিত মানুষের হয়ে দর্শক বা শ্রোতার মনের প্রতিবাদী চেতনার শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করেছেন। নাটকের উদ্দেশ্য সাধনে নাট্যকারের এ এক অভিনব কৌশল। উৎপল দত্তের ‘তিতুমীর’ নাটকে এরকম দুজন গায়ক চরিত্র রয়েছে। এদের দ্বারা উৎপল দত্ত যেমন দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন, তার সঙ্গে জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করার কাজ এবং ইনফরমার-এর কাজও সম্পন্ন করেছেন। সাজন গাজী ও শত্রুঘ্ন এদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে নিহিত জাতীয় চেতনার বীজ। শত্রুঘ্ন ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে এবং সাজন ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে পালা ক্রমে গান গেয়েছে। সাজনের গানে জনজাগরণের বার্তা শোনা যায়—

“সামাল সামাল ও বাঙালি
সামাল দে তোর ঘর
কেন বাসভবনে পরকে এনে
নিজে হচ্ছিস পর
তোর লক্ষ্মীর কৌটো যাচ্ছে চুরি
তুই হুঁস করলি কই।”^{২০}

কখনও বাগুণ্ডিতে পাইরন সাহেবের গৃহে, কখনও বা সরফরাজপুরে অগণিত জনগণের মাঝখানে এরকম গান গাওয়ার পাশাপাশি দু’পক্ষের মধ্যে যাতায়াতের যেমন অসুবিধা ছিল না ঠিক তেমনি অসুবিধা হত না পাইরন সাহেব ও জমিদার কৃষ্ণদেবের গোপন খবর তিতুমীরের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে। দু’টি নাটকেই রয়েছে জনগণকে সতর্ক করার প্রয়াস, সংগঠিত করবার প্রচেষ্টা। কিন্তু জনসাধারণকে সংগঠিত করতে হলে একটা পরিশীলিত পরিকল্পনা দরকার এবং সেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হলে দরকার শত্রু পক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে আগাম অবগত হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে তথ্য সরবরাহকারী কর্মীর। ‘তিতুমীর’ নাটকে সাজন গাজী এবং শত্রুঘ্ন এ কাজ করেছে। গোপন তথ্য সরবরাহ করে এরা তিতুমীরের ওয়াহাবি আন্দোলনে সাহায্য করেছে। নির্দিষ্ট একটা আদর্শকে সামনে রেখে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমবেত প্রতিরোধ গঠনের এই জায়গাতেই উৎপল দত্ত স্বতন্ত্র, বাদল সরকারের নাটকে সেটা ঠিক এভাবে লক্ষিত হয় না।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় একজন অন্যতম উৎপল সমকালীন নাট্যধারার নাট্যকার। শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তিনিও কলম ধরেছেন। সমাজের বঞ্চিত, প্রতারিতদের হয়ে তিনিও প্রতিবাদ

জানিয়েছেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে।

তাঁর ‘কাল বা পরশু’ একটি প্রতীবাদী নাটক। চলমান সমাজের অবস্থা, অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে দীপ্ত অথচ এক নাটকীয় প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। তাপস ও তার পরিবার এবং একই চেহারার তিনটি ছেলের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাধ্যমে। তাপস ও তার পরিবার রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার প্রতিনিধি, আর তিনজন তরুণ হল সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এরা স্থিতাবস্থাকে আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চায়।

সমাজের এক শ্রেণীর তরুণদের বৈনাশিক মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে এ নাটকে। এরা বর্তমান ক্ষুধ, বঞ্চিত, প্রতারিত সমাজের প্রতিনিধি, এ নাটক বর্তমান কালের কঠিন সমাজ সমস্যার নাটক। কথা বনাম কাজের বিরূপ পার্থক্য নিয়ে যে সমাজ চলছে, সে সমাজের সামনে বিপদ দেখা দিতে বাধ্য। দেশ তথা সমাজের নেতৃবৃন্দ যদি এই কঠিন সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তরুণ সমাজ হয়তো বা অন্য কোন ভয়ঙ্কর পথ গ্রহণ করবে। সেটা কেবল সময়ের অপেক্ষা।

নাটকের শেষে তাপসের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রাক মুহূর্তে প্রথম ছেলেটি তাই জানিয়েছে যে, বোমা ফাটানোর কাজে তারা এখনও ঠিক মতো তৈরী হয়নি, তবে বোমাটা তৈরী হয়ে গেছে। আর সে জন্যই বিপদটা রয়েই গেল। দেশটা যদি এভাবে চলে তবে কাল হোক বা পরশু একদিন বোমাটা ফাটবেই।

নাট্যকার দেখিয়েছেন যে বঞ্চিত তরুণ সমাজ প্রচলিত ব্যবস্থা এবং আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে চায়, কিন্তু একবারে নির্মম হওয়ার আগে অপরাধীকে একবার শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিতে চায়। তাতেও না শুধরালে বাধ্য হয়ে প্রতিশোধের বোমা ফাটবে এমনই একটা ভিন্নমাত্রার প্রতিবাদী মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে এ নাটকে। জার্মান নাট্যকার ম্যাক্সফ্রিশ এর লেখা ‘বিডেরম্যান উনড ডি ব্রাণ্ড স্টিফার’ নাটকের ঘটনাকে অনুসরণ করে লেখা ‘কাল বা পরশু’ নাটকের এ ছেলে তিনটি দেশের বিকৃত মানুষ, বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আগুন জ্বালিয়ে বিকৃত প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কিন্তু উৎপলের নাটকে শোষিত মানুষ সমবেত ভাবে প্রতিশোধের সংগ্রামে লিপ্ত। ‘ত্রুশবিদ্ধ কুবা’ ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ প্রভৃতি নাটকে সাধারণ মানুষের সংগঠিত লড়াইয়ের চিত্র দেখতে পাই। ‘ত্রুশবিদ্ধ কুবা’ নাটকে কমিউনিস্ট এবং ফিদেলিস্টরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং কুবা-র মাটিতে তাদের পরাজিত করেছে। রাষ্ট্রনায়ক বাতিস্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রত্যাশা নিয়ে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মীরা এস্ত্রেমাদাকে তরয়ানা শহরের মেয়র তৈরী করেছিল। কিন্তু এস্ত্রেমাদা মেয়র হবার পর প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে জাতীয়তাবাদী

পার্টিতে যোগদান করেছিল। প্রতিশ্রুতি ভাঙবার শাস্তি হিসেবে কমিউনিস্ট নেতারা সিলভানো এস্ত্রেমাদাকে প্লাৎসা শহরে ভোরবেলার প্রার্থনা সভায় ৫০০০ পাউণ্ড টি.এন.টি শক্তির বিস্ফোরণের দ্বারা হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ভুল করে বোমা বহনকারী ব্যক্তি কমিউনিস্ট নেতা চে-গুয়েভারা-র জনসভায় নিয়ে যায় এবং সঠিক সময়ে জানতে পেরে বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়। বোমার আঘাত হানতে না পারলেও ইস্টারের ডিনার টেবিলে বসে এস্ত্রেমাদা ও তার সঙ্গীরা যখন নাটক দেখছিল সেসময় নাটকের মুখোশধারী ‘মৃত্যু’ চরিত্রের ইঙ্গিতে কুবা-র গেরিলা বাহিনীর টমি গান-এর আঘাতে এস্ত্রেমাদার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আসলে ‘মৃত্যু’ চরিত্রে অভিনয় করেছিল গেরিলা নেতা ভালেহো। এস্ত্রেমাদা জনতার কাছে বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় দিয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতার ভোটে জয়ী হয়েও রাজশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাই জনতার আদালতে তার বিচার হয়েছে। কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘কাল বা পরশু’ নাটকে রাজশক্তির প্রতিনিধি তাপসকে শুধু সতর্ক করেছে তিনজন যুবক।

‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকেও দেখা যায় কমিউনিস্ট নেত্রী মাদাম লান-হু আগ্নেয়াস্ত্র সমেত হো-বো গ্রামের ড. ভিনের হাসপাতালে এসে মার্কিন নরখাদকদের নিরস্ত্র করে এবং অনেকজনকে গুলি করে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের কাছে মার্কিন আগ্রাসনকে পিছু হটতে হয়।

তাই দেখা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ে নাট্য চরিত্র তিনজন যুবক যেখানে চরম প্রতিশোধ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত, সেখানে উৎপলের নাট্যচরিত্র ভালেহো হোক বা লান-হু (ত্রাক), এরা চরম প্রতিশোধের জায়গায় বিন্দুমাত্র পিছপা হয়নি বরং সে সুযোগ কখন পাবে তার জন্য নিরস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। আর এ জায়গাতেই প্রকট হয়েছে উৎপলের নিজস্ব মতাদর্শ, যা অন্য সকলের তুলনায় স্বতন্ত্র।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় উদ্ভট নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করলেও জীবনের শেষ পরিণতি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। “অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে দলবদ্ধ জনশক্তির সংগ্রাম এবং জনশক্তির অস্তিম জয়, শোষণ হীন মুক্তিপথের দিকে মানুষের বিজয়ী অভিযান ইত্যাদি তাহার ভাবাবেগরঞ্জিত সংলাপের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।”^{২২}

তাঁর ‘রাজরক্ত’ নাটকে দেখা যায় যে, রাজা এতদিন অপর সকল মানুষের রক্ত শোষণ করেছে সেই মানুষগুলিই আবার সম্মিলিত হয়ে রাজরক্তের তৃষণয় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। একা নয় ঐক্যবদ্ধ শক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে নাটকটিতে।

তবে ‘রাজরক্ত’ নাটকটি লিখবার পর মোহিত চট্টোপাধ্যায় অ্যাবসার্ড রীতিতে লেখা

প্রতিবাদী চিন্তা এবং বামপন্থী মতবাদের উদ্ভাপ ও উগ্রতা থেকে সরে আসেন। সহিষ্ণু ও সহানুভূতি শীল দৃষ্টি নিয়ে তিনি জীবনকে দেখতে শুরু করেন। মানবতাবাদী দৃষ্টি ও সর্বাত্মক জীবনবোধ নিয়ে তিনি তাঁর পরবর্তী নাটক লেখেন। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী উৎপলের নাটকেও বাদ পড়েনি। ‘ক্রুশবিদ্ধ কুবা’ নাটকে তার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কমিউনিস্টরা যে জনদরদী তা ব্লাসকোর কথায় বার বার ফুটে উঠেছে। এস্ত্রোমাদাকে মারবার জন্য যে বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, তা ব্লাস্ট হলে এস্ত্রোমাদার সাথে ইষ্টার উৎসবের আরো অনেক লোক মারা পড়বে। ব্লাসকো এটা মনে প্রাণে চায়নি। এ নিয়ে ভালদার সঙ্গে তার তর্ক-বিতর্ক এমনকি হাতাহাতিও হয়। এখানেও উৎপলের স্বতন্ত্রতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

মনোজ মিত্র আধুনিক কালের একজন কৃতি নাট্যকার। তিনি উৎপল দত্তের সমকালীন নাট্যধারার নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম একজন। “মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে, ব্যক্তি মানুষ ও ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে, ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী শোষণের বিরুদ্ধে অসহনীয়তার চূড়ান্ত মুহূর্তে বিদ্রোহে মানুষের ফেটেপড়া বিষয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের অ্যালিয়েনেশন ও ব্যক্তি বিচ্ছেদ”^{২২} প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর নাটক রচিত হয়েছে। আর সবশেষে বড় কথা হল মনোজ মিত্র “শ্রেণীকে চরিত্র না করে মানুষকে নিয়ে আসেন ঘটনার কেন্দ্রে। মানুষ, যার মধ্যে আছে হাজারো জটিলতা, ভালো-মন্দ, নীচতা-মহত্ত্ব, লোভ-ঔদার্য, ক্ষমা-নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির এক দুর্লভ দ্বন্দ্বিক সমন্বয়, যাকে একটা ঢালাও ছাঁচে ফেলে কখনোই দেখেন না মনোজ।”^{২৩}

তাঁর ‘চাক ভাঙা মধু’ নাটকটিতে সুন্দর বন অঞ্চলের মহাজনপীড়িত এক দরিদ্র পরিবারের কথা রয়েছে। নাট্যকারের বাস্তবতা এখানে নগ্নরূঢ় ও নিষ্ঠুর। এই মানুষগুলি —

“মহাজন শ্রেণীর অমানষিক শোষণ ও উৎপীড়নে তাহার সর্বরিক্ত দারিদ্র্যের চরমতম দুর্দশায় পতিত, তাহাদের মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত ও ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু যেদিন তাহারা প্রত্যাঘাতের হিংস্র নেশায় মাতিয়া ওঠে সেদিন তাহারা অতিনির্মম ও ক্ষমাহীন।”^{২৪}

তাই দেখা যায় ডুলিতে করে যখন জমিদার অঘোর ঘোষের সর্পদংশিত মৃতদেহ ওঝা মাতলার উঠোনে পৌছায় তখন ক্রোধে প্রতিশোধ স্পৃহায় ফেটে পরে মাতলা। কোন মতেই সে বিষ ঝাড়তে চায় না। মাতলা ও তার কাকা জটা নানা অজুহাত খোঁজে। তাদের এই ক্ষোভকে, প্রতিবাদকে আরো কৌশলী মাত্রা প্রদান করে জটা। “ইমন ভাব দেখাতি হবে, যেন আমরা রুগী ঝাড়তি পস্তুত।”^{২৫} কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা বিষ ঝাড়ানোর ভান করবে।

শেষ পর্যন্ত মেয়ে বাদামীর অনুরোধে মাতলা বিষ ঝাড়তে বাধ্য হয়। যে অত্যাচারী

জমিদার মাতলাদের জীবনকে অত্যাচারে অত্যাচারে সর্বস্বান্ত করেছে তাঁকেই যখন বাঁচানো হল তখন তার ফল হল ঠিক উশ্চৈ। কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অঘোর ঘোষের মধ্যে বৃদ্ধি পেল আরও নিষ্ঠুরতার মাত্রা। যার পরিণাম হিসেবে ব্রুন্ধ জনতার প্রতিরোধ ও বাদামীর প্রতিশোধের আশুনে তাকে প্রাণ হারাতে হল। ‘দেবী গর্জনের’ মতো এখানেও দেখা যায় ব্রুন্ধ জনতা সমবেত ভাবে মারমুখী হয়ে জমিদার অঘোর ঘোষকে হত্যা করেছে। এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে জনতার ক্রোধের প্রকাশ, কোন মতাদর্শ নয়। কিন্তু উৎপল দত্তের নাটকের চরিত্রগুলি একটা মতাদর্শকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছে এবং পরিকল্পনা মাফিক প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংঘটিত হয়েছে। ‘তিতুমীর’ নাটকে তিতুমীর, ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকে নীলমণি রায় ওরফে শান্তিদা, ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকে মাদাম লান-হু ওরফে ব্রাক—এই বীর সেনানীদেরকে তাই দেখা যায়, এঁরা কৌশলে লড়াইয়ের পক্ষে। সম্মুখ সমরের আত্মহত্যায় এঁরা বিশ্বাসী নয়। আড়াল থেকে অস্ত্র হেনে হেনে শত্রুকে পরাস্ত করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। আর এখানেই উৎপল স্বতন্ত্র। ‘চাকভাঙা মধু’ নাটকে আরো দেখা যায় জমিদার শুধু জমিই নয় গরীব মানুষের ঘরের মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে। মার্কসবাদী চেতনা, চাষী-মজুর সমবেত ভাবে শ্রেণী সচেতন হয়ে জোতদারকে আক্রমণ এ সবই ঘটেছে একটা সরস বিদ্রূপ ঠাট্টার মাধ্যমে। একটাই বিষয় ক্রমশ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে গোটা নাটকে। কিন্তু উৎপলের যে কোন নাটকেই একটা বিষয় ক্রমশ বহুমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাদামী সর্বহারার মানবতাবোধ ও মানবিকতা নিয়ে হাজির হয়েছে ‘চাকভাঙা মধু’ নাটকটিতে। প্রাণের মূল্য সে বোঝে। নিজের পেটের সন্তানকে বাঁচানোর জন্য যেমন সে তার বাবার কাছে দাবি করে খাবার জোগাড়ের জন্য, ঠিক তেমনি শত্রু হলেও মহাজন অঘোর ঘোষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আকুল আবেদন জানায়। এই আবেদন কি কেবল মাত্র ভয় বা নিজের স্বার্থের জন্য? তা নয়। একটি প্রাণকে সে ধারণ করেছে। তাই প্রাণের মূল্য সে বোঝে। প্রাণকে সে রক্ষা করতে চায়। বাদামী প্রাণের কোনো শ্রেণীবিচার করে না।

বাদামীর আরেক রূপ আমরা লক্ষ্য করি। প্রাণ ফিরে পেয়ে অঘোর যখন বেহারা দিয়ে মাতলাকে বেঁধে রাখে; তারই সামনে বাদামীকে তুলে নিয়ে যেতে চায় নিজের ঘরে; তখনি সংহারক মূর্তি ধারণ করেছে বাদামী। এ বাদামী অতি বাস্তব। গ্রাম বাংলার অগণিত শোষিত বঞ্চিত মানুষের কাঙ্ক্ষিত বাস্তব। কচ্ছপ ধরা সড়কি দিয়ে সে অঘোরকে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এক মানুষকে হত্যা করে সে রক্ষা করল অনেক মানুষের শোষিত প্রাণ। সেই সঙ্গে নিজের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ও তার প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল সে।

প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত নবজাত প্রাণের প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করতে

দেখা যায় মনোজ মিত্রের ‘সাজানো বাগান’ নাটকটিতেও। বৃদ্ধ বাঞ্জারামের সাধের বাগান স্বার্থপর অর্থলোভী এক জমিদারের নজরে পড়ে ধ্বংস হতে চলে। জমিদার বাঞ্জাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যে, বাঞ্জার মৃত্যুর পর সে বাগান হবে জমিদারের এবং যতদিন বাঞ্জা বেঁচে থাকবে ততদিন জমিদার তাকে মাসে দু’শ টাকা করে দেবে।

জমিদার কৌশল করে বাগান দখল করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। বাঞ্জার নাতি যখন নাতিবৌকে নিয়ে তার কাছে ফিরে আসে, বৌটি যখন সন্তানসম্ভবা, বাঞ্জা তখন নতুন করে বাঁচতে চায়। জমিদার বাঞ্জাকে ফলিডল খেয়ে মরতে বলে। শতকষ্টে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে মরতেও চাইল। “কিন্তু নবজাতকের কান্না শুনিয়ে আবার তাকে বাঁচিতে হয়। আবার সে বাঁচিয়া উঠে। মনোজ মিত্রের নাটকে এভাবে জীবনের অন্তিম জয় প্রতিষ্ঠিত হয়।”^৬

শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয়, ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা, মৃত্যুর বদলে জীবনের প্রতিষ্ঠা মনোজ মিত্রের নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার কৌতুকরসের হেঁয়ালিতে অতি সূক্ষ্ম শিল্প কুশলতায় হাজারো বাধা বিপত্তিকে পরাস্ত করে শেষ পর্যন্ত মুক্ত আকাশে উড্ডীন করেছেন নতুন প্রাণের বিজয় কেতন।

তবে উক্ত নাট্যকারদের নাটকে যে প্রতিবাদের ধরণ রয়েছে তা থেকে উৎপলের নাটকের প্রতিবাদী চেতনা একটু আলাদা। শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ হোক আর মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘কাল বা পরশু’-এ নাটকগুলির প্রতিবাদ পাঠক বা দর্শকের মনকে গভীর থেকে নাড়া দেয়। দেশ কালের প্রেক্ষিতে সমস্ত সমাজ মানুষের মন যেন ভাবীকালের ভবিতব্য নিয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। এই অস্থিরতার পাশাপাশি মানুষের মন যেন সমাধানের রাস্তা খুঁজে বেড়ায়। বাদল সরকারের ‘লক্ষ্মীর ছাড়ার পাঁচালী’ কিংবা মনোজ মিত্রের ‘চাক ভাঙা মধু’ সব ক্ষেত্রে একই বিষয় ভাবায়।

কিন্তু উৎপল দত্তের অঙ্গার, কল্লোল ‘ফেরারী ফৌজ’, এসব নাটকের প্রতিবাদ শাসক শক্তির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ। এতে দর্শক বা পাঠকের আবেগ কাজ করে। মনের গভীর থেকে ভীত ততটা নড়ে ওঠে না। তবে ‘টিনের তলোয়ার’ ‘সূর্যশিকার’ এসব নাটক ভিন্ন মাত্রা দাবি করে। প্রতিবাদ থাকলেও সমগ্র সমাজের মানুষের কাছে ভাবীকালের একটা প্রশ্ন চিহ্ন দাঁড় করিয়ে দেয়।

অবশেষে বলা যায় উৎপল দত্তের নাটকে প্রতিবাদ যেন যুদ্ধের সাজে প্রস্তুত হয়েছে। শ্রেণী সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর নাটকে যুদ্ধের অস্ত্র বলসে উঠেছে সচেতন সংগ্রামী মানুষের সুপ্ত প্রতিবাদী চেতনা। আর এ জায়গাতেই সমকালীন অন্যান্য

নাট্যকারদের খারায় উৎপল দত্তের নাটকের প্রতিবাদ স্বতন্ত্র মাত্রায় বিরাজমান।

উৎপল দত্ত একাধারে যেমন নাট্যকার তেমনি অভিনেতা পরিচালক এমনকি শিক্ষকও বটে। দেশ-বিদেশের নাট্যতত্ত্বে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আবার যখন কোন দর্শকের জন্য নাটক উপস্থাপন করেছেন, সে বিষয়েও তাঁর যথাযথ বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর এই পাণ্ডিত্য-মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে; তার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান তার সভ্যতার বিবর্তন সম্পর্কে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন—“নিজেকে শিক্ষিত না করে যেহেতু অন্যকে শিক্ষিত করা সম্ভব নয়, তাই একজন থিয়েটার কর্মীর প্রথম ও প্রধান কাজ হবে নিজেকে শিক্ষিত করা।”^{২৭} তার এ শিক্ষা অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা।

একজন থিয়েটারকর্মীকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে তাই দেখা যায় ‘দি গ্রেট বেঙ্গল’ থিয়েটারের পরিচালক বেণীমাধব আলু-পটল বিক্রিকারিনী ময়নাকে অভিনেত্রী শংকরীতে রূপান্তরের প্রসঙ্গে নিজের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তুলনা করেছেন। “আমি শিক্ষক। আমি অস্ট্রা। আমি তাল তাল মাটি নিয়ে প্রতিমা গড়ি। আমি এক দিক থেকে ব্রহ্মার সমান। আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।”^{২৮} থিয়েটারের স্বার্থে, অভিনেতা—অভিনেত্রীদের স্বার্থে এবং নিজের উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে উৎপল দত্তের এ দায়বদ্ধতা, এ প্রাণপন প্রচেষ্টা তাঁকে এক মহান শিক্ষকের আসনে অসীন করেছে।

উৎপল দত্তের অভিনয়, প্রযোজনা, দল পরিচালনা, নাট্য নির্দেশনা ও অন্যান্য নানা প্রকার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যেভাবে নাটক লিখেছেন এবং প্রতিটি নাটকের মধ্যেও যেভাবে স্বস্ত্রতার আশ্রয় দিতে পেরেছেন তা বিস্ময়কর। সময়ের স্রোতে ডুব দিয়ে তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দর্শন ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে গেছেন। আর এখানেই তাঁর নাটক একদিকে বিপুলভাবে সমর্থিত এবং অন্যদিকে সমালোচিত হয়েছে। উৎপল দত্ত সম্পর্কে একজন নাট্যগবেষক বলেছেন— “জীবনের বহিরঙ্গম উপকরণ ও নীতিবোধের দিক দিয়া জাতিতে জাতিতে পার্থক্য থাকিলেও ইহার মৌলিক বিষয়ে যে ঐক্য আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া দেশ ও কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া থাকে।”^{২৯} উৎপল দত্তের নাটক হয়তো সেজন্যই কালোত্তীর্ণ।

পরিচালক হিসেবেও উৎপল দত্ত সফল হয়েছিলেন। একজন পরিচালকের প্রথম কাজ হল দর্শকের মনযোগ আকর্ষণ করা এবং যতক্ষণ প্রযোজন তাকে নিবিষ্ট বসিয়ে রাখা। আর একাজ করতে পারলে তবেই নাট্যকারের অন্যান্য উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা যেমন—জ্ঞানের সঞ্চারণ, কাব্য সুসমা সৃষ্টি, বিনোদন, আবেগ অনুভূতির উৎসারণ ইত্যাদি—পূরণ করা সম্ভব হয়। এগুলো করতে না পারলে পরিচালকের সব কিছুই ব্যর্থ শ্রম হয়। এ বিষয়ে নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী মহাশয়

বলেছেন— “কিন্তু আমার দেখা কোন পরিচালকের কাজে এই গুণ বা শক্তি যদি সবচেয়ে বেশি লক্ষ করে থাকি তিনি হচ্ছেন উৎপল দত্ত।”^{৩০}

বিভাস চক্রবর্তী মহাশয় আরো বলেন যে, কোন নাটক বা চলচিত্র দেখে অনেক সময় তার সঠিক অর্থ বোঝা যায় না। পরিচালক বা স্রষ্টা যা বোঝাতে চেয়েছেন অনেক সময় তার উল্টোটা বুঝে থাকি। পরে তাঁর সাক্ষাৎকার বা রচনা পড়ে বুঝতে পারি সঠিকটা। কিন্তু উৎপল দত্তের নাটকে এমনটার অবকাশ নেই।

“তার নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি যে কথাগুলি বলতে চান, সে কথা ঠিক নিজের মতো করে, যেভাবে চান সেভাবে দর্শকের কাছে উনি পৌঁছে দিতে পারেন। ওঁর এমন কোন নাটক নেই, যেখানে উনি যা চাননি তেমন কোন বক্তব্য দর্শকের কাছে পৌঁছে তাকে খানিক বিভ্রান্ত করেছে। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই নানা ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু উৎপল দত্ত তো সেই অর্থে কখনওই শিল্প স্রষ্টা বলতেন না। তাঁর ভাষায় তিনি একজন ‘প্রচারক’ মাত্র। তাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য সাধানে তিনি সর্বদা সফল। নানা প্রকরণে নাটককে আকর্ষণীয় করে কোন নির্দিষ্ট বক্তব্য তীব্র তীক্ষ্ণ জোরালো ভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার যে ক্ষমতা, তা আয়ত্ত করতে গেলে উৎপল দত্তের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে একজন থিয়েটারের ছাত্রকে।”^{৩১}

তিনি একই সঙ্গে নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজনার দায়িত্ব সফল ভাবে সম্পন্ন করেছেন, বাংলা নাটকের ইতিহাসে এমন পারঙ্গম ব্যক্তির আবির্ভাব খুব বেশি নেই। বাংলা নাটক এমন সুদৃঢ় রাজনীতি ও ইতিহাস নির্ভর কোন দিনও ছিলনা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন বিতর্কিত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিত্বও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার নাট্যজগতে খুব বেশি চোখে পড়ে নি। বাংলা নাট্য জগতে হয়তো উৎপল দত্তই এক মাত্র নাট্য-ব্যক্তিত্ব যার সঙ্গে বিশ্ব নাট্য আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও নৈকট্য গড়ে উঠেছিল।

এছাড়াও বলা যায় নাট্য জগতের প্রায় সব ক্ষেত্রেই উৎপল দত্তের একটা স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রতিটি নাটকেই তাঁর একটা প্রতিবাদের বিশেষ ধরণ রয়েছে। তাই তাঁর নাট্যচিন্তা একটু ভিন্ন গোত্রের।

নাটকের মাধ্যমে তিনি সরাসরি জনগণের কাছে সমাজ বদলের ডাক পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করতেন নাটক সরাসরি মানুষের কথা বলবে এবং মানুষের সমস্যা ঠিক কোথায় তা খোঁজার চেষ্টা হবে নাটকে। নাটক দেখতে এসে মানুষ তাদের নিজেদের জীবন

এবং সে জীবনের সমস্যা প্রত্যক্ষ করবে। আর তার সাথে সেটার সমাধানের উপায় খুঁজে নেবে।

মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাঁর নাটকে শ্রেণী সংগ্রামের চিত্রই দেখা যায় বেশি। সমকালীন ঘটনার বর্ণনার পাশাপাশি তিনি সমাজদ্বন্দ্বের চেহারাটাকেও তুলে ধরেছেন এবং শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের কাহিনীকেই রূপ দিয়েছেন তাঁর নাটকে। আর সেই জন্যই তাঁর নাটকে দেখা যায় সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।

উৎপল দত্ত নিজেকে শিল্পীর পরিচয় দেননি। এ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন উক্তি— "I am a Partisan, not Neutral and I believe in Political struggle ..." তার নাটক ছিল 'এজিট প্রুপের' মূর্ত প্রকাশ। প্রোপাগাণ্ডা ও এজিটেশন শব্দ দুটির মিশ্রণে তৈরী 'এজিট প্রুপ' কথাটি। উৎপল দত্তের নাটকে এজিটেশন এবং প্রোপাগাণ্ডা দুই-ই রয়েছে। একটা সাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য মানুষের মধ্যে ক্রোধের জাগরণ ঘটানো হল এজিটেশন, আর প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ঘৃণা জাগানোর প্রচার হল প্রোপাগাণ্ডা।

“মিনার্ভা পট থেকে বিবেক নাট্যসমাজ ও পরে পিপলস লিটল থিয়েটার ইত্যাদি পটাস্তরে তাঁর বিভিন্ন নাটক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মার্কসবাদে আদ্যস্ত বিশ্বাসী নাট্যকার পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্ত বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারে অত্যন্ত বিরল দৃষ্টান্তমূলক একমাত্র অ্যাজিটের শিল্পী। তাঁর সাফল্য এক মাত্র তিনিই।”^{৩৩}

বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী এবং শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত সৈনিক উৎপল দত্তের প্রতিবাদী সত্তার বিচরণ যেমন নাটক রচনা, নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় অসামান্য অভিনয়ের বিচরণ ভূমিতেও। এমনকি নাট্য আঙ্গিক, নাট্যনির্দেশনা, সংলাপ প্রয়োগে তীক্ষ্ণতা, বৌদ্ধিক বিদ্রূপের শাণিত প্রয়োগে, রূঢ় বাস্তব পরিবেশে এবং অসামান্য শিল্পোৎকর্ষে উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যে একজন স্বতন্ত্র মাত্রার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার।

তথ্যসূত্র :

১. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, প্যাপিরাস, কোলকাতা ০৪, পৃ. ১৩৩-১৩৪।
২. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা

- ০৯, পৃ. ৩২৫।
৩. তদেব, পৃ. ৩৩১-৩৩৪।
৪. তদেব, পৃ. ৩২৭।
৫. পবিত্র সরকার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৫।
৬. 'শব্দ' সাহিত্য পত্রিকা, উৎপল দত্ত বিশেষ সংখ্যা ২০১০, কোলকাতা-২৮, পৃ. ৬১।
৭. 'দেশ' পত্রিকা, ৩০ মার্চ, ১৯৯১, সাক্ষাৎকার : সুরজিৎ ঘোষ।
৮. কুন্তল মুখোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী দর্শন', উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫, কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৪।
৯. হীরেন ভট্টাচার্য, বাংলা রাজনৈতিক নাটক ও উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত : এক সামাজিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা-৭৩, পৃ. ১৮৭।
১০. তদেব, পৃ. ১৮৮-১৮৯।
১১. তদেব, পৃ. ১৯০।
১২. বিজন ভট্টাচার্য, দেবীগর্জন, বিজন ভট্টাচার্যের দেবীগর্জন, ড. উষাপতি বিশ্বাস (সম্পাদিত), ইউনাইটেড বুক এজেন্সিস, কোলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ১৪৪।
১৩. উৎপল দত্ত, 'তীর' উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, পৃ. ৩২৬।
১৪. তদেব, পৃ. ৩২৬।
১৫. শম্ভু মিত্র, চাঁদ বণিকের পালা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, অগ্রহায়ণ, ১৪০৬, পৃ. ১২১-১২২।
১৬. তদেব, পৃ. ১২২-১২৩।
১৭. তদেব, পৃ. ১২১।
১৮. তদেব, পৃ. ১২০-১২১।
১৯. বাদল সরকার, লক্ষ্মী ছাড়ার পাঁচালী , তৃতীয় ধারার নাটক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ২১।
২০. উৎপল দত্ত, 'তিতুমীর', উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৫, পৃ. ৩৪০।

২১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ৪৩৮।
২২. পবিত্র সরকার, নাট্যকার মনোজ মিত্র শীর্ষক ভূমিকা অংশ, মনোজ মিত্রের নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পৃ.৪।
২৩. তদেব, পৃ. ০৪।
২৪. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ৪৩৩।
২৫. মনোজ মিত্র, 'চাক ভাঙা মধু', মনোজ মিত্রের নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১।
২৬. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ৪৩৪।
২৭. বিভাস চক্রবর্তী, 'উৎপল দত্তঃ এক মহান শিক্ষক', উৎপল দত্তঃ এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ.২২৩।
২৮. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ, ১৪১১, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৯০।
২৯. জোছন দস্তিদার, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০৯।
৩০. বিভাস চক্রবর্তী, 'উৎপল দত্তঃ এক মহান শিক্ষক', উৎপল দত্তঃ এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ.২২২।
৩১. তদেব, পৃ. ২২২-২২৩।
৩২. Utpal Dutta, Towards A Revolutionary Theatre; M.C. Sarkar & sons Pvt., 14 Bankim Chatterjee Street, Cal-73, P. 34.
৩৩. 'পশ্চিমবঙ্গ', উৎপল দত্ত, স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৭৯।